দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

কর্নেল মো. ইসমাইল হোসেন, এসজিপি, পিএসসি

প্রকাশ : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৭

শিক্ষাকে একটি জাতির অগ্রগতি ও সার্বিক কল্যাণের ভিত্তিমূল ধরা হয়। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি, নৈতিকতা ও নেতৃত্বগুণের বিকাশ ঘটায় এবং একজন শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একটি দেশের রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার জনগণের শিক্ষার মান, নৈতিকতা এবং দেশপ্রেমের ওপর। সুশিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত প্রজন্মই পারে একটি দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দিতে। এই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী। এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরা, যা সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক ছিল। সেই সময় শিক্ষাকে তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা যায় :বৈদিক শিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষা এবং মুসলিম শিক্ষা। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের কেন্দ্রবিন্দু, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ সন্তানদের পুরোহিত হিসেবে গড়ে তোলা। শিক্ষকমণ্ডলী ছিলেন কেবল ব্রাহ্মণ, এবং শিক্ষার মাধ্যমে ছিল সংস্কৃত ভাষা। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ‘পরিষদ’, ‘টোল’ এবং ‘পাঠশালা’ নামে পরিচিত ছিল। পাঠশালায় পঠন-পাঠন, গণনা এবং পৌরাণিক কাহিনী শেখানো হতো। শিক্ষকরা কোনো আর্থিক বেতন গ্রহণ করতেন না, বরং পূজা-পার্বণে প্রাপ্ত দক্ষিণা এবং ফসল তোলার সময় প্রাপ্ত অংশই ছিল তাদের জীবিকার অবলম্বন। বৌদ্ধ শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতি, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল নির্বাণ লাভ। ‘অষ্টমা’ বা ‘অষ্টপন্থা’ নামক আটটি সৎ উপাদানের চর্চাই ছিল এই শিক্ষার সারবস্তু। এর মাধ্যমে দুঃখময় পার্থিব জীবন থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা হতো। বৌদ্ধ শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এর গণতান্ত্রিক প্রকৃতি, যেখানে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সবার জন্য জ্ঞানার্জনের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা মসজিদকেন্দ্রিক ছিল, যা ‘মক্তব’ নামে পরিচিত ছিল। চার বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক কলেমা পাঠের মাধ্যমে মক্তবে ভর্তি হতো। প্রাথমিক স্তরে নামাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুরা ও কেরাত শিক্ষা দেওয়া হতো এবং সাত বছর বয়স থেকে কুরআন শিক্ষা, লিখন, পঠন এবং সাধারণ হিসাবনিকাশ শেখানো হতো। মসজিদের ইমামগণ এই শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত

ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতে নিজেদের শাসন দৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়, তখন তারা একটি সুশিক্ষিত ও অনুগত নাগরিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত লরেন্স স্কুল, সেন্ট পল'স স্কুল এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুল ছিল ব্রিটিশ শিক্ষা ও সামরিক সংস্কৃতির প্রতীক। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রম ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং আধুনিক। সুশৃঙ্খল শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং দক্ষতা বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হতো। এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বহু মেধাবী ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থী বেরিয়ে এসেছেন, যারা পরবর্তীকালে সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। এসব বিদ্যায়তন শুধু জ্ঞানের প্রসার ঘটায়নি, বরং ব্রিটিশ সংস্কৃতি, ভাষা এবং জীবনধারাকে ভারতীয় সমাজের মূলধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এক নতুন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। সূচনালগ্নে এগুলো ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা ও সৈন্যদের সন্তানদের জন্য নির্মিত হলেও, কালক্রমে এগুলো ভারতীয় সমাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের জন্যও জ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকংশই আজ ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, তবে কিছু প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখে তাদের অতীত গৌরব ধরে রেখেছে। এগুলো কেবল অতীতের স্মারক নয়, বরং ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা ও সামরিক ঐতিহ্যের এক জীবন্ত দলিল, যা আজও অসংখ্য শিক্ষার্থীর স্বপ্নকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী পরিচালিত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এগুলো মূলত সামরিক কর্মকর্তাদের সন্তানদের জন্য নির্মিত, সাধারণ শিক্ষার্থীরাও সেখানে অধ্যয়নের সুযোগ পেত। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ক্যাডেট কলেজগুলো ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম ক্যাডেট কলেজ ১৯৫৮ সাল ফৌজদারহাটে স্থাপিত হয়, এরপর পর্যায়ক্রমে ঝিনাইদহ (১৯৩৬), মির্জাপুর (১৯৬৪) এবং সিলেটে (১৯৬৫) আরো কয়েকটি ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সামরিক বাহিনীর জন্য যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমের মতো গুণাবলি গড়ে তোলা। কঠোর সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকায় শিক্ষার্থীদের মান ছিল উন্নত এবং ফলাফলও ছিল প্রশংসনীয়। ক্যাডেট কলেজ ছাড়াও, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের মতো কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো, যেখানে সামরিক কর্মীদের পাশপাশি স্থানীয় সাধারণ শিক্ষার্থীরাও পড়ার সুযোগ পেত। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় সেনাবাহিনী পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভ,মিকা ছিল একটি মিশ্র চিত্র। যদিও এগুলো মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে একটি সুশৃঙ্খল ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে সহায়তা করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে যে, কঠোর সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের মধ্যে সুপ্ত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এসব প্রতিষ্ঠানে আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিদ্যমান, যা দেশের সামারিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব তৈরিতে অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিক্ষায় সম্পৃক্ততার ইতিহাস স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সেনানিবাস এলাকায় শিশুদের শিক্ষার উদ্দেশ্য স্কুল স্থাপন করা হলেও ধীরে ধীরে এর কলেবর বেড়েছে। বর্তমানে সেনাবাহিনী পরিচালিত বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে ক্যাডেট কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল ও কলেজ, মিলিটারি কলেজসমূহ (বগুড়া, জয়পুরহাট) আর্মি মেডিক্যাল কলেজ, আর্মি ইউনিভার্সিটি উল্লেখযোগ্য। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান জনশক্তি তৈরি। সেনা পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলোতে পাঠদান পদ্ধতি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, মানসম্মত, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। কেবল পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক জ্ঞান নয় বরং একটি শিক্ষার্থীর সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এখানে। নিয়মিত প্রাতঃসমাবেশ, ইউনিফরম ড্রেস কোড, সময়মতো ক্লাস, সাংগঠনিক কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা গড়ে ওঠে। নৈতিক গুণাবলি একজন ব্যক্তিকে সুশাসনের বাহক হিসেবে গড়ে তোলে, যা জাতির সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। জ্ঞান অর্জনের সমান্তরালে সহশিক্ষা কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বগুণ, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। এসব বিদ্যায়তনে নিয়মিতভাবে বিতর্ক, নাটক, সংস্কৃতিচর্চা, বহুমুখী ক্লাব কার্যক্রম বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন হয়। এর মাধ্যমে আজকের ছাত্ররা আগামী দিনের জননেতা, প্রশাসক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠে। সেনাবাহিনীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতীয় দিবস, ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস পালনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশাত্মবোধক গান, রচনা, নাটিকা, প্রদর্শনী ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি দেশের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের মূল্যবোধ জাগ্রত করা হয়। অধিকন্তু শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক মনোভাব, জাতীয় ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। জাতি গঠনে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেনা পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলোতে সময়ানুবর্তিতা, নিয়মতান্ত্রিক দিনচর্চা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে। শুধু বাহ্যিক শৃঙ্খলাই নয় বরং নৈতিক শিক্ষা যেমন: সততা, দায়িত্ববোধ, পরোপকার, সহানুভূতি ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে জাতি নেতৃত্ব দিতে জানে না সে জাতি টিকে থাকতে পারে না। এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকশিত হওয়ার লক্ষ্যে সুসংগঠিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্কাউটিং, রোভার কার্যক্রম, ক্যাডেট কোর প্রশিক্ষণ, ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন, পরিচালনা কমিটি, সামরিক কায়দায় প্যারেড, জাতীয় দিবস উদযাপনে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বদান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং এবং তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের মানসিকতা তৈরি করে। এর ফলে তারা ভবিষ্যতে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুদক্ষ নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয়। বর্তমান বিশ্বপ্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল সেনাবাহিনীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আইসিটি ল্যাব, স্মার্টবোর্ড, অনলাইন ক্লাস, রোবটিক্স ক্লাব, প্রোগ্রামিং ক্লাব, ঝঞঊগ শিক্ষা, মালটিমিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এতে করে শিক্ষার্থীরা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নিয়ামক যেমন দক্ষতা বিশ্লেষণ, সমস্যার সমাধান, উদ্ভাবন, তথ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞানমেলা, হ্যাকাথন ও উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদের চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক সংস্কারমুক্ত ও উদার নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে। দেশের সার্বিক নারীশিক্ষা বিস্তারে এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখানে মেয়েরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধ্যয়ন করে এবং বহুমুখী সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ পেশাজীবী ও নেতৃত্বগুণসম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে ওঠার সুযোগ রাখা হয়। মেয়েদের নিরাপদ পরিবেশ, আত্মরক্ষা প্রশিক্ষক, নেতৃত্ব কর্মশালা, গার্লস গাইড, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্দীপনামূলক শিক্ষায় উৎসাহিত করার মাধ্যমে আত্মসচেতন স্বনির্ভর নারীশক্তি বিনির্মাণে ভ‚মিকা রাখে। দেশের অনগ্রসর নারী শিক্ষায় এরূপ পদক্ষেপ সর্বজনীন সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতি গঠনের জন্য শুধু জ্ঞান নয়, মানবিকতা ও সহমর্মিতা অপরিহার্য। সেনাবাহিনীর স্কুল ও কলেজসমূহে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধ শেখানো হয়। দুর্যোগকালীন স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম দারিদ্র্য তহবিল সংগ্রহ ও পথশিশুদের সাহায্য প্রদান, শীতার্তদের বস্ত্রদান, বৃক্ষ রোপণ, রক্তদান, পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রম, অগ্নিনির্বাপণ, মশক নিধন কার্যক্রম ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি, সহানুভ‚তি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে, যা একটি মানবিক জাতি গঠনের পূর্বশর্ত। একজন আদর্শ শিক্ষকই পারে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করতে। সেনাবাহিনীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকরা প্রতিযোগিতামূলক স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে নিয়মিত উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষণরা কেবল পেশাগত দায়িত্ব নয় বরং নৈতিক আদর্শ, দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠার মূল্যবোধ অর্জনে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে ছাত্র শিক্ষক বন্ধন মজবুত হয় এবং শিক্ষার্থীদের সুদৃঢ় মনোবল ও অটুক আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক এই তিন অংশীজনের মিথক্রিয়ায় গতিশীল শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিয়মিত মত বিনিময়, পিটিএ মিটিং, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার আয়োজন করে শিক্ষার সমান ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

সেনাবিহিনী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কেবল ঢাকা কিংবা বিভাগীয় শহরেই নয় বরং প্রত্যন্ত এলাকায় ক্যান্টনমেন্টগুলোতেও ছড়িয়ে আছে। ঐ সব এলাকায় শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছে। একে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ধর্ম, বর্ণ ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে পাঠ গ্রহণ করার দরুন পারস্পরিক সহনশীলতা ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক একতা সৃষ্টি হয়। ফলে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ কিংবা বিভাজনের প্রবণতা হ্রাস পায় এবং জাতীয় ঐক্য জোরদার হয়। সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সেনাবাহিনীর মূলনীতি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সততা ক্লাব, ন্যায়বিচারচর্চা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা হয়। এটি ভবিষ্যতের জন্য দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরীণ কার্মকাণ্ডে রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক অনুদান, পক্ষপাতিত্বের অবকাশ নেই অর্থাৎ নিয়োগ থেকে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পর্যন্ত সব কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলো নিয়মিতভাবে শীর্ষস্থানে অবস্থান করে। ফলাফল ছাড়াও প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড অংশগ্রহণ, উচ্চশিক্ষায় দেশ-বিদেশে বৃত্তি লাভ, জাতীয় বির্তক, কুইজ, সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনে উচ্চতর মান ধরে রাখতে সক্ষমতা লাভ করেছে। এসব অর্জন শুধু শিক্ষার্থী নয় দেশের জন্যও গৌরবের, যা বাঙালি জাতিকে বৈশ্বিক মঞ্চে স্বকীয়তা দান করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে। কিছু সুপারিশ করা যেতে পারে প্রযুক্তিগত শিক্ষা উপকরণগুলো সময় উপযোগী উৎকর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা। অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বনির্ভর উদ্যোক্তা তৈরির প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা। বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আত্ম উন্নয়নে ব্রতী হওয়া। হাতে-কলমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ব্যাপক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা। দেশের দুর্গম অঞ্চল, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, পার্বত্যাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্কুল ও কলেজসমূহ কেবল শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয় বরং একটি জাতির সুনাগরিক গড়ার সূতিকাগার। এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, নেতৃত্ব, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, একাবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতিকে যেভাবে প্রস্তুত করছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। শুধু সামরিক শৃঙ্খলার ধারক নয় বরং একটি শিক্ষিত দক্ষ দেশপ্রেমিক জাতি গঠনের অন্যতম কারিগর

হিসেবেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্কুল-কলেজসমূহ ইতিহাসে জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের উচিত, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতি ও অনুশীলনকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ করা একটি আধুনিক আলোকিত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

কর্নেল মো. ইসমাইল হোসেন, এসজিপি, পিএসসি
লেখক: বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা

ইত্তেফাক/এমএএস